মহিষ পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি)

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ
Training on Improved/Modern Livestock Technology Management and Practice

প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ঃ ১ দিন

উপদেষ্টা

ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা
পরিচালক
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সম্পাদনায়

ডা: মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন খান
ট্রেনিং এন্ড কমুউনিকেশন স্পেশালিস্ট
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সহযোগিতায়

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) : প্রাণিসম্পদ অংগ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ ওও প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ): প্রাণিসম্পদ অংগ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
উপজেলা ঃ ---------- জেলা ঃ ----------

প্রশিক্ষণ শিরোনাম ঃ মহিষ পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) খামারী/কৃষক সদস্যদের উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার (CIG Farmers Training on Improved / Modern Livestock Technology Management and Practice).

প্রশিক্ষণের মেয়াদ ঃ ১ দিন।

প্রশিক্ষণের তারিখ ঃ -----/-----/------

প্রশিক্ষণের স্থান ঃ -----------------

অংশগ্রহণকারী ঃ (সিআইজি এর নাম) মহিষ পালন সিআইজি খামারী/কৃষক

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ঃ ৩০ জন

প্রশিক্ষণ সূচী

সেশন	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী
১ম সেশন	০৮.৩০ – ০৯.০০	প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)
	০৯.০০ – ০৯.৩০	প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)
	০৯.৩০ – ১০.৩০	মহিষের উন্নত জাত নির্বাচন ও উন্নত বাসস্থান	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
২য় সেশন	১০.৩০ – ১১.০০	চা- বিরতি	
	১১.০০ – ১২.০০	মহিষ পরিচর্যায় উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
৩য় সেশন	১২.০০ – ১৩.০০	মহিষের খাদ্য ব্যবস্থাপনা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
	১৩.০০ – ১৪.০০	নামাজ ও মধ্যাহ্ন বিরতি	
৪র্থ সেশন	১৪.০০ – ১৫.০০	মহিষের প্রজনন, গর্ভকালীন পরিচর্যা ও নবজাত বাছুরের পরিচর্যা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
৫ম সেশন	১৫.০০ – ১৬.০০	সিআইজি সদস্যদের কার্যক্রম; পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
	১৬.০০ – ১৬.৩০	চা - বিরতি	
	১৬.৩০ – ১৭.০০	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)

অধিবেশন পরিকল্পনা

প্রশিক্ষণ শিরোনাম ঃ মহিষ পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) খামারী/কৃষক সদস্যদের উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার (CIG Farmers Training on Improved / Modern Livestock Technology Management and Practice).

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ঃ

- গ্রামীণ পরিবেশে মহিষ পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে সিআইজি সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করণ।
- মহিষ খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করণ।

প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রত্যাশা ঃ

- প্রশিক্ষণের ফলে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষক/খামারীদের দক্ষতা ব্যবধান কমবে।
- কৃষক/খামারীগন এর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁরা নিজেরাই খামারের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে।
- কৃষক/খামারীগন প্রশিক্ষণে লব্ধ জ্ঞান নিজ খামারে বাস্তবায়ন করে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে এবং এ বিষয়ে নন-সিআইজি কৃষক/খামারীগনকে পরামর্শ দিতে পারবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন ঃ

এনএটিপি-২ এর আওতায় নতুন উপজেলাগুলোতে প্রতি ইউনিয়নে ০৩টি করে সিআইজি এবং প্রতি সিআইজিতে ৩০জন খামারী/কৃষক সদস্য রয়েছে। যে কোন একটি সিআইজি-এর এই ৩০ জন সদস্যকে একত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীরা সুনির্দিষ্ট ফরমে নিজেদের নাম নিবন্ধন করবেন। এ জন্য প্রশিক্ষণ শুরুর আগে প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer) নাম নিবন্ধন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণের জন্য অভীষ্ট দল ঃ ৩০ জন সিআইজি খামারী/কৃষক সদস্য।

নাম নিবন্ধন এর লক্ষ্য ঃ

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করা যাতে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে পরিচিতি ঘটে এবং কোর্স সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ঃ

ব্যানার, নিবন্ধন ফরম, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন ঃ

- প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুর আগে সকল প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহন।
- প্রশিক্ষণ সংগঠক/ইউএলও উদ্বোধন অনুষ্ঠান এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
- সভাপতির অনুমতিক্রমে যথা নিয়মে প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুকরণ।

কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ সংগঠক যা আলোচনা করবেন ঃ

১. প্রশিক্ষণ শুরু করার সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের জন্য আহ্বান জানাবেন। এ পর্যায়ে সিআইজি সদস্যগণ নিজের নাম ও কোন গ্রামে থেকে এসেছেন জানিয়ে পরিচিত হবেন।
২. পরিচিতি পর্ব শেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক তাঁর স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন। তিনি বক্তব্য প্রদানের সময় সংক্ষিপ্তভাবে এনএটিপি-২ সর্ম্পকে সকলকে অবহিত করবেন।
    - বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক, ইফাদ ও ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে দেশের ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলায় ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম - ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
    - এনএটিপি-২ এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে - প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারী/কৃষকদের খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উপাদিত পণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রাপ্তিতে বাজারে প্রবেশাধিকারে তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
    - উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রাণিসম্পদ, কৃষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ পরিচালনায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
    - এ জন্য প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের নির্মীত ভবনে দুইটি কক্ষ নিয়ে FIAC গঠন করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে FIAC সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এর CEAL-কে উপস্থিত সিআইজি সদস্যগণের সংঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্তি করণ ঃ

- উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে একজনকে এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্য থেকে একজনকে বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।
- সিআইজি সদস্যদেরকে অত্র প্রশিক্ষনে সক্রিয় অংশগ্রহনের আহ্বান ও প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে খামারের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ পূর্বক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্তি করণ।

১ম সেশন ঃ

মহিষের উন্নত জাত নির্বাচন ও উন্নত বাসস্থান সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

মহিষের উন্নত জাত নির্বাচন

- গৃহপালিত মহিষের জাতকে প্রধানত ২ (দুই)টি শ্রেনীতে ভাগ করা হয়- নদী মহিষ (River Buffalo) এবং জলা মহিষ (Swamp Buffalo),
- সাধারণত নদী মহিষ দুধ উৎপাদনের জন্য এবং জলা মহিষ মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়,
- নদী মহিষের মধ্যে মুররা নীলি, রাভি, জাফরাবাদি, সুরাটি মেশানো উল্লেখযোগ্য,
- আমাদের দেশে নদী মহিষের মধ্যে মুররা নীলি জাতের মহিষ বেশী পরিচিত। মুররা নীলি জাতের মহিষ এর উৎপত্তিস্থল মূলত ভারত ও পাকিস্তান। মুররা নীলি জাতের মহিষের বৈশিষ্ট্য ঃ
    - গায়ের রং ঘন কাল ও ধূসর
    - দেহের গঠন ও আকার বেশ বড়
    - গাভীর মাথা সরু ও নিখুঁত, লম্বা
    - ঘাড় সরু ও লম্বা

- পা খাঁটো ও লম্বা
- ওলান বেশ বড়
- দেহের চামড়া নরম ও মসৃন
- বছরে প্রায় ২৭০-২৮০দিনে ১৪০০-২০০০ লিটার দুধ দেয়, তবে উৎকৃষ্ট মানের গাভী থেকে ২৫০০-৩৫০০ লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায়,
- দুধে চর্বির পরিমান বেশী থাকে, প্রায় ৭%
- প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ মহিষের ওজন প্রায় ৫৫০ কেজি এবং গাভী মহিষের ওজন প্রায় ৪৫০ কেজি হয়ে থাকে।

মহিষের উন্নত বাসস্থান

আমাদের দেশে গ্রামীণ পরিবেশে দু-চারটি মহিষ পালনে বাসস্থান উপর তেমন গুরত্ব দেয়া হয় না। তবে মহিষ খামার করতে হলে মহিষের উন্নত বাসস্থান এর বিষয়ে গুরুত্ব দেয় অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই মহিষের খামার করতে হলে নিম্ন বিষয়গুলো বাসস্থান নির্মানে লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

- ঘর স্বাস্থ্যসম্মত ও আরামদায়ক হতে হবে ,
- ঘরে পর্যাপ্ত আলোবাতাস ঢোকার ব্যবস্থা থাকতে হবে,
- ঘরের মেঝে মজবুত হবে, পিচ্ছিল ভাব থাকলে বিপদজনক হবে,
- স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবার প্রাত্র (Manger) ব্যবহার করতে হবে,
- প্রতিটি মহিষের জন্য বয়স অনুপাতে গোয়ালঘরে প্রয়োজনীয় জায়গা থাকতে হবে,
- গোয়ালঘর দৈনিক সময়মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে,

২য় সেশন ঃ

মহিষ পরিচর্যায় উন্নত ব্যবস্থাপনা ঃ

- পানির প্রতি মহিষের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে, তাই নদী মহিষ পরিস্কার পানি ও জলাশয়ের মহিষ ডোবা-নালার কর্দমাক্ত পানি গায়ে মেখে দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে,
- যেখানে নদী-ডোবা নেই সেখানে ছায়াযুক্ত স্থানে মহিষ রেখে পাইপের সাহায্যে দিনে অন্তত দু'বার পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে,
- মহিষের সংক্রামক রোগের টিকা প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে যেমন- তড়কা, ক্ষুরা রোগ, গলাফুলা (প্রয়োজন বোধে), ইত্যাদি।

গো/মহিষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

এই সেশনে প্রাণির বিভিন্ন রোগ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। উক্ত রোগসমূহের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে ভাইরাস জনিত রোগের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। উক্ত রোগে আক্রান্ত প্রাণি যাতে ব্যাকটেরিয়াজনিত জীবাণু দ্বারা দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হয়ে রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি না পায় সেজন্য ভাইরাস জনিত রোগেরও চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। তবে যে কোন রোগ হওয়ার অগেই প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উত্তম। তাই যে সকল সংক্রামক রোগ এর কারণে প্রাণির মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে সে সকল রোগের প্রতিকার হিসাবে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাণিকে টিকা প্রদানের সময় একটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তা হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে টিকা প্রদান করা। তা না হলে উক্ত টিকা থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। অসুস্থ

প্রাণিকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত টিকা প্রদান করা ঠিক হবে না। তাছাড়া টিকা প্রদান এর পূর্বে প্রাণিকে কৃমি মুক্ত করতে হবে। তা করা হলে প্রদানকৃত টিকা থেকে উত্তম ফল (Antibody) পাওয়া যাবে। পানির প্রতি মহিষের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে, তাই নদী মহিষ পরিস্কার পানি ও জলাশয়ের মহিষ ডোবা-নালার কর্দমাক্ত পানি গায়ে মেখে দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে নদী-ডোবা নেই সেখানে ছায়াযুক্ত স্থানে মহিষ রেখে পাইপের সাহায্যে দিনে অন্তত দু'বার পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে,

ক্ষুরা রোগ (Foot-and-mouth disease/ hoof-and-mouth disease/FMD) ঃ

এ রোগ ভাইরাস জনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। গ্রামে কোথাও কোথাও এ রোগকে ক্ষুরাচল, চপচপিয়া, বাতা বা বাতনা রোগ বলা হয়ে থাকে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি দ্বিক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণি এ রোগে আক্রান্ত হয়।

রোগ বিস্তার ঃ

- রোগাক্রান্ত প্রাণি থেকে বাতাসের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি রোগ ছড়িয়ে পড়ে।
- ক্ষুরা রোগ জীবাণু দুষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমেও ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
- মুখে, জিহ্বায় ও ক্ষুরায় ফোস্কা পড়ে। পরে ফোস্কা ফেটে ঘা হয়।
- মুখে ঘা হওয়ায় মুখ দিয়ে লালা ঝরে এবং এ অবস্থায় প্রাণি ক্ষেতে পারে না।
- পায়ের ক্ষুরায় ঘা হওয়ায় তীব্র ব্যথা হয় ও হাঁটতে/কাজ করতে পারে না এবং দুর্বল হয়ে যায়।
- দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমে যায়।
- এ রোগে বাছুরের মৃত্যুর হার বেশি।

রোগের প্রতিকার ঃ

- অসুস্থ প্রাণিকে সুস্থ প্রাণী থেকে আলাদা রাখা।
- রোগ হওয়ার আগেই সুস্থ সকল প্রাণিদের ক্ষুরা রোগের টিকা দেয়া।
- প্রতিদিন গোয়াল ঘর জীবাণুনাশক যেমন ডেটল বা ফিনাইল দ্বারা ভালভাবে ধুয়ে দেওয়া।
- প্রাণিকে নরম খাদ্য সরবরাহ করা
- প্রাণির ক্ষতস্থানের চিকিৎসা।

তড়কা রোগ (Anthrax)

এ রোগ ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি অতি তীব্র ও মারাত্মক সংক্রামক রোগ। প্রাণির দেহে সাধারণত খাবারের সাথে এ রোগ প্রবেশ করে। মাটিতে এ রোগের জীবাণু বহু বছর বেঁচে থাকে।

রোগ বিস্তার ঃ

- সাধারণত: বর্ষাকালের প্রথম দিকে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।
- স্যাঁতস্যাঁতে জমির ঘাস খাওয়ালে এই রোগ হয়, কেননা সেখানে এ রোগের জীবানু থাকার সম্ভাবনা থাকে।
- বৃষ্টি ও বন্যার পানির সাহায্যে এই রোগ ছড়ায়, তাই ভিজে যাওয়া খড় খাওয়ালে এই রোগ হতে পারে।
- তড়কায় আক্রান্ত মৃত প্রাণি কুকুর ও শৃগাল খেয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে এই রোগ ছড়ায়।
- মৃত পশুর চামড়া থেকেও এই রোগ ছড়ায়।

- তড়কা রোগে আক্রান্ত প্রাণির মৃতদেহ যে মাঠে রাখা হয়, তার চতুর্দিকের ঘাস খেলেও এই রোগ হতে পারে।
- তড়কা রোগের জীবাণু দ্বারা দুষিত পুকুর, নালা ও ডোবার পানি পান করলেও এই রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- এর রোগ অতি তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণী দ্রুত নিঃশ্বাস নেয় ও কৃষক/খামারী কিছু বুঝার আগেই অসুস্থ প্রাণির দেহ মাটিতে ঢলে পড়ে এবং খিচুনি দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যায়।
- তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণীর দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। জ্বর হবে ১০৪°-১০৭° F। এ সময়ে প্রাণির শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায় এবং বিভিন্ন মাংস পেশীর কম্পন শুরু হয়।
- প্রণির চোখের পর্দা লাল হবে এবং দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে থাবে (মিনিটে ৮০-৯০ বার)।
- এক পর্যায়ে অল্প সময়ে প্রাণিটি মাটিতে পড়ে যাবে এবং দ্রুত চিকিৎসা না করলে মারা যাবে।

তড়কা রোগে মৃত প্রাণির লক্ষণ ঃ

- মৃত প্রণির নাক, মুখ ও মল দ্বার দিয়ে আলকাতরার মত জমাটবিহীন রক্ত বাহির হবে।
- মৃত প্রাণির দেহ শক্ত হবে না।
- মৃত প্রণির পেট খুব দ্রুত ফুলে যাবে।

রোগের প্রতিকার ঃ

- এ রোগের জীবাণু সহজে মরে না, তাই জীবাণুনাশক ব্যবহার করে মৃত প্রাণিকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।
- কোন অবস্থাতেই মৃত প্রাণি পানিতে ফেলা যাবে না এবং মুচিকে দেওয়া যাবে না।
- আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখতে হবে ও সুস্থ প্রাণিকে তড়কা রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।
- তড়কা রোগে আক্রান্ত এলাকায় এ রোগ ছাগল/ভেড়াতেও হতে পারে, তবে ছাগল/ভেড়ায় এ রোগের টিকা প্রদান করলে মারাত্মক সমস্যাও হতে পারে। কেননা এ টিকা প্রদান স্থানে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভব হয়, তখন ছাগল/ভেড়া লাফালাফি শুরু করে দেয় এবং কখনও মারও যেতে পারে। তাই অতি প্রয়োজন হলে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে ছাগল/ভেড়াকে এ রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।

বাদলা রোগ (Black Quarter/B.Q.) ঃ

এ রোগ ব্যাকটেরিয়া জনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। বাংলাদেশে এ রোগ বৃষ্টি বাদলের মৌসুমে বেশী হয় বলে এ রোগকে বাংলায় বাদলা রোগ বলা হয়। সাধারণত ৬ মাস থেকে ২ বৎসর বয়সের যে সমস্ত প্রণির স্বাস্থ্য ভাল, তাদের এ রোগ বেশী হতে দেখা যায়। এ রোগে মৃত্যুর হার বেশী হয়।

রোগ বিস্তার ঃ

- সাধারণত: বর্ষাকালের প্রথম দিকে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।
- স্যাঁতস্যাঁতে জমির ঘাস খাওয়ালে এই রোগ হয়, কেননা সেখানে এ রোগের জীবাণু থাকার সম্ভাবনা থাকে।
- বৃষ্টি ও বন্যার পানির সাহায্যে এই রোগ ছড়ায়, তাই পানিতে ডোবা ঘাস খাওয়ালে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- বাদলা রোগের জীবাণু দ্বারা দুষিত পুকুর, নালা ও ডোবার পানি পান করলেও এই রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- অতি তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণীর আকস্মিক মৃত্যু হতে পারে।

- তীব্র প্রকৃতির হলে ক্ষুধামন্দা দেখা দিবে।
- জ্বর হবে এবং তা ১০৪°-১০৭° F পর্যন্ত হতে পারে।
- এই রোগে সাধারণত প্রাণির উড়ু, ঘাড়, কাঁধ ও কোমরের মাংশ আক্রান্ত হয়ে ফুলে উঠে।
- আক্রান্ত ফুলা স্থান কালচে দেখাবে এবং ফুলাস্থান গরম ও বেদনাদায়ক হবে।
- আক্রান্ত মাংস পেশীতে চাপ দিলে পচ্ পচ্ শব্দ হবে যা দ্বারা সহজেই বাদলা রোগ বুঝা যাবে।
- প্রাণি হাঁটতে পারে না ও খুঁড়িয়ে হাঁটবে।
- চিকিৎসায় বিলম্ব হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৮-৭২ ঘন্টার মধ্যে পশু মারা যাবে।

রোগের প্রতিকার ঃ

- আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখতে হবে।
- মৃত প্রাণিকে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে।
- স্যাঁতস্যাঁতে এলাকা চারণভূমি বা বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- পঁচা পুকুর, নালা এবং ডোবার পানি খাওয়ানো যাবে্ না।
- পঁচা ঘাস এবং পানির নিচের ঘাস খাওয়ানো যাবে না।
- বর্ষার ২ মাস পূর্বে ৬ মাস থেকে ২ বছরের সুস্থ সকল প্রাণিকে বাদলা রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

গলাফুলা রোগ (Hemorrhagic septicemia /HS) ঃ

এ রোগ ব্যাকটেরিয়া জনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। বাংলাদেশে প্রায় সকল ঋতুতে এই রোগ হয়। তবে বর্ষাকলে যখন গো/মহিষকে দিয়ে বেশি কাজ করানো হয় তখন এ রোগ বেশি হয়। বর্ষার শুরু এবং শেষে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। এ রোগ ডুবো অঞ্চলে বেশি হয় এবং মৃত্যুর হারও অনেক বেশী।

রোগ বিস্তার ঃ

- সুস্থ প্রাণি আক্রান্ত প্রাণির মলমূত্র দিয়ে দূষিত খাদ্য ও পানি খেয়ে এ রোগে আক্রান্ত হয়।
- প্রাণির দেহে এই রোগের জীবাণু স্বাভাবিক অবস্থাতেও বিদ্যমান থাকতে পারে। কোন কারণে যদি ঐ প্রাণিটি পীড়নের সম্মুখীন হয় যেমন, ঠান্ডা, অধিক গরম, ভ্রমনজনিত দুর্বলতা থাকে, তখন প্রাণির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে প্রাণিটি এই রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়।
- দীর্ঘদিন পুষ্টিহীনতায় ভুগলে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।।
- বর্ষার শুরুতে বৃষ্টিতে ভিজলে এবং ঠান্ডা লাগলে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।।
- প্রাণিকে কষ্টের সাথে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করলে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
- গরম এবং স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশেও এই রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- অতি তীব্র প্রকৃতির হলে, হঠাৎ করে প্রাণির জ্বর আসে, তাপমাত্রা বেড়ে যায় (জ্বর ১০৫°-১০৭° F)।
- ক্ষুধামন্দা হয়, নাক, মুখ দিয়ে লালা ঝরে ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাণী মার যায়।
- তীব্র প্রকৃতির হলে উপরের লক্ষণ ছাড়াও প্রথমে গলার নিচে, পরে চোয়াল, বুক, পেট ও কানের অংশ ফুলে যায়। এ অবস্থাতে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং প্রণি গলা বাড়িয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়।
- গলা ও গলকম্বল ফুলে যাবে, ফুলা জায়গায় টিপ দিলে ব্যাথা পাবে এবং বসে যাবে। গরম ও শক্ত হবে।
- শ্বাস নেয়ার সময় ঘাড় ঘাড় আওয়াজ হবে।
- কখনও কখনও পাতলা পায়খানা হতে পারে।

রোগের প্রতিকার ঃ

- আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখতে হবে।
- মৃত প্রাণিকে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে।
- স্যাঁতস্যাঁতে এলাকা চারণভূমি বা বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- সব সুস্থ প্রাণিকে সুস্থ অবস্থায় নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

গাভীর ওলান ফুলা রোগ বা ওলান প্রদাহ (Mastitis) ঃ

বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস ও মাইকোপ্লাজমা দ্বারা এই রোগ হয়। গাভীর জন্য এ রোগ একটি মারাত্মক রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা না হলে গাভীর ওলান নষ্ট হয়ে যাতে পারে।

রোগ বিস্তার ঃ

- ওলান বা বাঁটে যে কোন প্রকার আঘাত বা ক্ষত থাকলে সেখান দিয়ে ব্যাকটেরিয়া সহজেই প্রবেশ করে এ রোগ সৃষ্টি করে।
- অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে, ময়লা, গোবর ইত্যাদির উপর গাভী শয়ন করলে।
- বাচ্চা প্রসবের পর ওলানে ময়লা লাগলে এবং তা সময়মত পরিস্কার করা না হলে।
- ঘাসের চটা ওলানে প্রবেশ করালে।
- গোয়ালার অপরিষ্কার হাত ও বড় নখ দ্বারা গাভীর ওলানে ক্ষত হলে।
- বাছুর ওলানে জোরে গুতো মারলে।

রোগের লক্ষণঃ

- অতি তীব্র রোগের ক্ষেত্রে দুধের পরিবর্তন লক্ষণীয়, দুধ পাতলা ও কিছু জমাট বাঁধা হবে।
- দুধের রং পরিবর্তন হবে, দুধের সাথে রক্ত বের হবে।
- ওলান ফুলে যাবে, গরম থাকবে এবং শক্ত হয়ে যাবে।
- প্রাণির ওলানে ব্যাথা অনুভব করে, ফলে ওলানের মধ্যে হাত দিতে দেবে না।
- দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হলে দুধের পরিমাণ কমে যাবে ও ক্রমান্বয়ে দুধ ছানার মত ছাকা ছাকা হবে।
- ক্ষুধামন্দা, অবসাদভাব, জ্বর ইত্যাদি হবে।
- গাভী হাঁটতে চাইবে না, ধীরে ধীরে হাঁটবে।

রোগের প্রতিকার ঃ

- আক্রান্ত গাভীকে আলাদা করে চিকিৎসা করতে হবে।
- গাভীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হবে।
- ওলানে ঘাসের চটা প্রবেশ করান চলবে না।
- ময়লা যেন ওলানে না লাগে সেদিকে প্রসবোত্তর খেয়াল রাখতে হবে।
- গাভীকে খালি পেটে দুধ দোহন করাতে হবে, কেননা ঘাস পানি খেয়ে ভরা পেটে দুধ দোহন করা হলে ওলান ফুলা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,
- দুধ দোহনের পর জীবানু নাশক ঔষধ পানির সহিত মিশিয়ে দুধের বাট পরিস্কার করলে ওলান ফুলা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
- এ রোগ প্রতিরোধ করা খুব কঠিন, কারণ ওলানে কোন এন্টিবডি তৈরি হলে তা দুধের মাধ্যমে বের হয়ে যায়।

- তবে দুধ দোহনের পর জীবানু নাশক ঔষধ পানির সহিত মিশিয়ে দুধের বাট পরিস্কার করলে ওলান ফুলা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

নাভীতে ঘাঁ রোগ (Neval ill) ঃ

এ রোগ ব্যাকটেরিয়া জনিত কারণে ঘটে। সময়মত চিকিৎসা করা না হলে বাছুরের সাস্থ্যহানী হবে যা পরবর্তীতে বাছুরের সাভাবিক বৃদ্ধিতে ব্যঘাত ঘটবে।

রোগ বিস্তার ঃ

- বাচ্চা প্রসবের পর বাচ্চার নাভী জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে না ধুলে, কাঁচা নাভীতে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করলে।
- প্রণির ময়লাযুক্ত জায়গায় বাচ্চা শুলে।
- নাভী শুকাতে কয়েকদিন সময় লাগে, এ সময়ের মধ্যে নাভীতে মাছি বসলে।
- অনেক সময় গাভী বাচ্চার নাভী চেটে ক্ষত করে ফেলে এবং সেখান থেকে এই রোগের সৃষ্টি হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- নাভীর চারদিকে লাল হয়ে যাবে।
- নাভীর চারদিকে ফুলে যাবে।
- নাভীতে ব্যথা হবে এবং পুঁজ হবে।
- অনেক সময় নাভীতে পোকা পড়ে।
- বাছুর গাভীর দুধ খেতে চাবে না।
- গায়ে জ্বর থাকবে।

রোগের প্রতিকার ঃ

- বাচ্চা প্রসবের পর নাভী জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে ধৌত করে দিতে হবে।
- গাভী যাতে নাভী না চাটতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পেটের গোলকৃমি রোগ ঃ

এসকারিয়া নামক এক প্রকার গোলকৃমি দ্বারা এ রোগের কারণ ঘটে। এ রোগের চিকিৎসা না করা হলে প্রাণির, বিশেষ করে বাছুরের স্বাস্থ্যহানীসহ মৃত্যুও ঘটেতে পারে।

রোগ বিস্তার ঃ

- আক্রান্ত প্রাণির মল দিয়ে কৃমির ডিম বের হয়ে ঘাসকে দূষিত করে। সেই ঘাস খেলে এই রোগ হয়।
- আক্রান্ত গাভীর দুধ খেয়ে বাছুরের এই রোগ হয়।
- গাভীর জরায়ুতে ভ্রুণের ভিতরেও এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- আক্রান্ত প্রাণির ডায়রিয়া দেখা দেবে।
- অনেক সময় পায়খানা শক্ত হয়ে যাবে।
- ক্ষুধামন্দা দেখা দেবে।
- প্রাণি দিন দিন শুকিয়ে যাবে ও দুর্বল হয়ে যাবে।
- বাছুরের পেট বড় হয়ে যাবে।
- লোমের চাকচিক্য নষ্ট হয়ে যায়।

- মহিষের বাচ্চার ক্ষেত্রে চোখের পর্দা লাল হয়।
- বাড়ন্ত প্রাণির বৃদ্ধি কমে যায়। বয়স্ক প্রাণির উৎপাদন কমে যায় ও রক্ত শূণ্যতা দেখা যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- গবাদিপশুর গোবর যেখানে-সেখানে না ফেলে এক জায়গায় ফেলতে হবে।
- গোয়াল ঘর, আশপাশের জায়গা ও চারণভূমি পরিস্কার রাখা।
- গোয়াল ঘরে নিয়মিত চুন ব্যবহার করা ও জলাবদ্ধ জমিতে প্রাণিকে চরাণো যাবে না।

কলিজার পাতা কৃমি রোগ ঃ

প্রাণির একটি মারাত্মক কৃমি রোগ। সাধারণত ছাগল, গরু, মহিষ ও ভেড়ার এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগ বিস্তার ঃ

- কলিজা কৃমির লার্ভা শামুকের স্যাঁতস্যাঁতে বা নিচু জলাভূমির ঘাসের পাতায় লেগে থাকে। এই ঘাস খেলে পশু কলিজা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- বদহজম এবং মাঝে মাঝে ডায়রিয়া দেখা দেবে।
- থুতনীর নিচে পানি জমে ফুলে যাবে, এ অবস্থা হলে একে “বটল জ” বলে।
- রক্তশূণ্যতা হবে, ফলে চোখের পর্দা সাদা হয়ে যাবে।
- প্রাণিটি দিনে দিনে শুকিয়ে যাবে।
- তীব্র আক্রমণের ক্ষেত্রে পশু হঠাৎ মারা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- ডোবা, নালা ও বিলের ঘাস খাওয়ানো যাবে না। খাওয়াতে হলে রৌদ্রে একটু শুকিয়ে খাওয়াতে হবে।
- গবাদিপশুর গোবর এক জায়গায় জমা করে রাখতে হবে।
- মাঠের শামুক ধ্বংস করতে হবে।

উকুন; আঁঠালি; মাইটস

লক্ষণ ঃ

- অল্প আক্রমণে তেমন লক্ষণ বোঝা যায় না । তবে মাঝারি প্রকৃতিতে দীর্ঘমেয়াদী চর্ম প্রদাহ হয়। চুলকানি, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, ওজন হ্রাস ও বাছুরের লোম পড়ে যায়।
- অ্যানিমিয়া, অস্বস্তি বোধ, খাদ্য গ্রহণ হ্রাস, দৈহিক ওজন হ্রাস ও দুধ উৎপাদন কমে যায়। চুলকানি, রক্ত জমাট বাঁধা দাগ দেখা যায়, আঁটুলি বিভিন্ন রোগের বাহক হয়।
- চর্ম প্রদাহ, চুলকানি, লোম পড়া, খাদ্য গ্রহণ কমে যাওয়া, দুর্বল, স্বাস্থ্যহানী, চামড়া নষ্ট হয় ও পুঁজ সৃষ্টি হয়।

প্রতিকার ঃ

- প্রাণির দেহ ব্রাশ করা, গোসল করানো, উকুন ও আঁঠালি হাত দিয়ে মেরে ফেলা।
- গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দেয়া।
- প্রতিদিন গো/মহিষকে ভালভাবে গোসল করালে শরীর সুস্থ থাকে এবং দেহের পরজীবি, যেমন- উকুন, আঁঠালি, মাছি, মাইটস, ফ্লি আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে।

রক্ত আমাশয় (Coccidiosis) রোগ ঃ

আইমেরিয়া নামের এক জাতীয় পরজিবী (ককসিডিয়া) দিয়ে এই রোগ হয়। সময়মত চিকিৎসা না করা হলে বাছুর মারা যেতে পারে।

রোগ বিস্তার ঃ

- প্রাণির শোবার জায়গা ময়লা থাকলে এই রোগ হয়।
- গোবর মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ালে এই রোগ হয়।
- গাভী দোহন করবার সময় ওলান পরিষ্কার না করলে ময়লাযুক্ত ওলানের দুধ খেয়ে বাছুরে এই রোগ হয়।
- আক্রান্ত প্রাণির মলদ্বারা দূষিত খাদ্য ও পানি অন্য প্রাণি খেলে এই রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- আক্রান্ত প্রাণি রক্ত মিশ্রিত পায়খানা করে এবং অনেক সময় শুধু রক্ত পায়খানা করে।
- আক্রান্ত প্রাণি পায়খানা করার সময় কোৎ দেয় ও ডাকে।
- লেজের গোড়ায় রক্ত মিশ্রিত গোবর লেগে থাকে।
- ঘন ঘন পানি পান করে, দেহের তাপ বৃদ্ধি পায় এবং অরুচি দেখা দেয়।

প্রতিকার ঃ

- পরস্কার পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে এ রোগের প্রধান প্রতিকার
- সময়মত চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা।

পেট ফাঁপা রোগ (Tympanitis)

এ রোগ প্রাণির একটি সাধারনণ রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা হলে প্রাণিটি সহজেই সুস্থ হয়ে যায়।

রোগ বিস্তার ঃ

- অধিকমাত্রায় ঘাস/খাদ্য, পানি খেলে এই রোগ হয়।
- অনেকদিন খরা হওয়ার পর হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ার পর কচি ঘাস হয়। সেই ঘাস যদি প্রাণি অধিক পরিমাণে খায় তাহলে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে ।
- যে সমস্ত প্রাণি খেসারীর ভূষি, মাসকালাইয়ের ভূষির সাথে প্রচুর পরিমাণ পানি খায় তাদের পেট অতিরিক্ত ভর্তির ফলে এই রোগ হয়।
- যে জমিতে ইউরিয়া সার সদ্য ব্যবহার করা হয়েছে, সেই জমির ঘাস খেলে এই রোগ হয়।
- গলায় কোন জিনিস/খাদ্য আটকিয়ে গেলে, অসাধারণ খাদ্য বেশি পরিমাণে খেলে এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণঃ

- পেটের ভিতরে গ্যাস জমা হওয়ার ফলে পেটফুলে যায়।
- পেট ফুলে যাওয়ার সাথে সাথে প্রাণির অস্থিরতা ও চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়।
- পেট ব্যাথার জন্য অনেক প্রাণি প্রায়ই মাটিতে শোয় ও উঠে।
- অনেক সময় পিছনের পা দিয়ে প্রাণি পেটে লাথি মারতে থাকে।
- প্রাণি খুব ঘন ঘন শ্বাস নেয়।
- জিহ্বা বের হয়ে যায় এবং মুখ দিয়ে লালা পড়তে থাকে।
- নিঃশ্বাসের গতি খুব বেশি হয় এবং হৃদস্পন্দন খুব বেড়ে যায়।
- পেটের বাম পার্শ্বে থাপ্পড় দিলে ধপ ধপ শব্দ করে।

- প্রাণির খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।
- প্রাণির পায়খানা বন্ধ হয়ে যায়।
- ঐ ক্ষেত্রে পশুর জ্বর থাকে না।

রোগ প্রতিকার ঃ

- প্রাণির খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।
- সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

বদহজম রোগ ঃ

এ রোগ প্রাণির একটি সাধারণ রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা হলে প্রাণিটি সহজেই সুস্থ হয়ে যায়।

রোগ বিস্তার ঃ

- হঠাৎ প্রাণির খাদ্য পরিবর্তন করলে এই রোগ হয়। যেমন-এক অঞ্চলের গরু অন্য অঞ্চলে নিয়ে গেলে, বাজার হতে গরু কিনে আনলে এইরূপ হয়ে থাকে।
- নষ্ট হয়ে যাওয়া খাদ্য খাওয়ালে এই রোগ হয়।
- গাভীর গর্ভফুল অনেক সময় গাভী খেয়ে ফেললে এই রোগ হতে পারে।
- প্রাণিকে পরিমাণ মত পানি না খাওয়ালে এই রোগ হয়।
- অনেকদিন যাবৎ শুধু খড় খাওয়ালে বা অন্য কোন খাদ্য না দিলে এই রোগ হয়।

রোগের লক্ষণঃ

- পশুর ক্ষুধা হঠাৎ কমে যায়।
- দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমে যায়।
- প্রাণির মল কঠিন ও পরিমাণ অল্প হয়।
- কোন কোন প্রাণির মাজল শুকনা থাকে।

রোগ প্রতিকার ঃ

- প্রাণির খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।
- সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ডাইরিয়া (Diarrhoea) ঃ

এ রোগ প্রাণির একটি সাধারণ রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা হলে প্রাণিটি সহজেই সুস্থ হয়ে যায়। তবে চিকিৎসায় দেরী হলে পানি স্বল্পতায় প্রাণিটি মারা যেতে পারে।

রোগ বিস্তার ঃ

- পঁচা ও বিনষ্ট হয়ে যাওয়া খাদ্য প্রাণিকে খাওয়ালে ডায়রিয়া হয়।
- ঘাসের সাথে বালি মিশ্রিত থাকলে সেই ঘাস প্রাণি খেলে এই রোগ হয়।
- গাভীর বাচ্চা প্রসবের পর প্রথমে যে শাল দুধ বাহির হয় সেই দুধ বাছুরকে না খাওয়ালে সহজেই ডায়রিয়া হয়।
- অধিক পরিমাণ খাদ্য খাওয়ালে এই রোগ হয়।
- খাদ্য ও পানির পাত্র দীর্ঘদিন যাবৎ পরিষ্কার না করে সেই পাত্রে খাদ্য ও পানি খাওয়ালে এই রোগ হয়।
- প্রসবের পর প্রাণির শরীর পরিষ্কার না করলে এই রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- পাতলা পায়খানা হয় এবং পায়খানার সাথে রক্ত ও আম থাকে।
- পায়খানা দুর্গন্ধযুক্ত হয়।
- কখনও কখনও হজম না হওয়া খাদ্যবস্তু পায়খানার সাথে বের হয়ে আসে।
- পায়খানার রং কালো বা হলুদ হতে পারে।
- ঘন ঘন পায়খানা হতে পারে।
- মলত্যাগের সময় অনেক সময় প্রাণি কোৎ দিতে পারে।
- পাতলা পায়খানার কারণে প্রাণির দেহে শুষ্কতা দেখা দেয়।
- প্রাণির পেটের ভিতরে কল কল শব্দ শোনা যায়।
- ক্ষুদামন্দা দেখা দেয়।
- প্রাণি নিস্তেজ হয়ে যায়।

রোগ প্রতিকার ঃ

- প্রাণির খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।
- নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘাস বা খড় খাওয়ানো যাবে না।
- প্রাণির খাবারের ও পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে।
- প্রাণিকে পুকুর, ডোবা, নালার পানি খাওয়ানো যাবে না। সর্বদা নির্দিষ্ট পরিষ্কার পাত্রে বিশুদ্ধ পানি পান করাতে হবে।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সকল সময় শুকনা রাখতে হবে।
- সময়মত চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা।

গর্ভফুল আটকে যাওয়া ঃ

এ রোগ প্রাণির একটি সাধারনণ রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা হলে প্রাণিটি সহজেই সুস্থ হয়ে যায়।

রোগ বিস্তার ঃ

- অপরিণত বাচ্চা প্রসব (সময়ের পূর্বেই বাচ্চা হওয়া)
- সংক্রামক রোগ, যেমন ব্রুসেলোসিস।
- দৈহিক দুর্বলতা, ক্যালসিয়ামের অভাব।

রোগের লক্ষণ ঃ

- গর্ভফুল যোনী মুখে ঝুলে থাকে।
- গর্ভফুল ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাহির হয় না।
- খাদ্য গ্রহণে অনীহা।
- জ্বর হতে পারে।

প্রতিকার ঃ

- ২৪ ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল না পড়লে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করা।
- কোন অবস্থাতেই ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড় গর্ভফুল হাত দিয়ে টেনে বের করা যাবে না। কারণ এর ফলে গাভী বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।

দুধ জ্বর রোগ (Milk Fever)
রোগের কারণ ঃ

- রক্তে ক্যালসিয়ামের অভাব হলে এই রোগ হয়।
- মাথা ও পা কাঁপতে থাকে এবং পশু একস্থানেই দাঁড়িয়ে থাকতে চায়।
- চলতে গেলে টলতে থাকে, বিশেষ করে পিছনের পায়ে জোর কমে যায়।
- প্রাণি নিস্তেজ হয়ে দেহের একপাশে মাথা গুজে শুয়ে থাকে।
- মাজল শুকনা থাকে।
- শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়।
- হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের গতি কমে যায়।

প্রতিকার ঃ

- প্রাণির খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।
- সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৩য় সেশন ঃ

মহিষের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

আমাদের দেশীয় মহিষের খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি সাধারণত তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে এদের নিকট থেকে আশানুরূপ উৎপাদনও পাওয়া যায় না। অথচ মহিষকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস, পরিমিত প্রক্রিয়াজাত খড়, দানাদার খাদ্য (কুড়া, গমের ভূষি, চাউলের খুদ, খৈল, কলাই, মটর, খেশারী, কুড়া ইত্যাদি), পর্যাপ্ত পরিমানে পরিস্কার পানি (নলকুপের টাটকা পানি) সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা, নিয়মিত কৃমিনাশক চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হলে এদের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যায়। আমাদের দেশে গবাদি পশুর সবচেয়ে সহজলভ্য ও সাধারণ খাদ্য হল খড় যার ভিতর আমিষ, শর্করা ও খনিজের ব্যাপক অভাব রয়েছে। বর্তমানে খড়কে ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করলে তার খাদ্যমান বহুগুণে বেড়ে যায়।

খাদ্য উপকরণে যে পুষ্টি উপাদান অধিক পরিমানে থাকে তাকে সে জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন-

- শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভুট্টা, গম, কাওন, চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি, ইত্যাদি)।
- আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, তিলখৈল, শুটকিমাছ, মিটমিল, ইত্যাদি)।
- চর্বি জাতীয় খাদ্য (এনিমেল ফ্যাট , হাঁস-মুরগির তৈল, ভেজিটেবল অয়েল, সার্কলিভার ওয়েল, ইত্যাদি)।
- ভিটমিন জাতীয় খাদ্য (শাকসব্জি ও কৃত্রিম ভিটামিন)
- খনিজ জাতীয় খাদ্য (ঝিনুক , ক্যালশিয়াম ফসফেট, রকসল্ট, লবন, ইত্যাদি)।
- পানি ঃ দেহ কোষে শতকরা ৬০- ৭০ ভাগ পানি থাকে। তাই কোন প্রাণী খাদ্য না খেয়েও কিছু দিন বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া সামান্য কিছু দিনের বেশী বাঁচে না।
  - সাধারণত দেহ থেকে পানির ক্ষয় হয় মলমূত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ।
  - অপরদিকে পানি আহরিত হয় পানি পান করে, রসালো খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেহের ভিতর বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।
  - দেহের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।

➢ প্রাণির দেহে পানির কাজ ঃ

- খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য বস্তু নরম ও পরিপাকে সহায্য করে।
- খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টি উপাদান তরল করে দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহণ করে।
- দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও দেহকে সতেজ রাখে।
- দেহের ভিত্তিতে দুষিত পদার্থ অপসারণ করে।
- দেহের গ্রন্থি হতে নিঃসৃত রস, হরমোন,এনজাইম এবং রক্ত গঠনে ভূমিকা রাখে।

প্রাণির খাদ্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন ঃ

- আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য, যেমন ঃ খড় , সবুজ ঘাস বা কাঁচা ঘাস, ইত্যাদি
- দানাদার জাতীয় খাদ্য, যেমন ঃ চালের কুঁড়া, গমের ভূষি, খেসারি ভাঙ্গা, তিল বা বাদাম খৈল, ইত্যাদি
- সহযোগী অন্যান্য খাদ্য যেমন ঃ খনিজ উপাদান, ভিটামিন ইত্যাদি।

- প্রাণিকে খড় কেটে ও কাটা খড়ের সহিত ১০% চিটাগুর মিশিয়ে খাওয়ানোর উপকারিতা,
- প্রাণিকে সবুজ/কাঁচা ঘাস খাওয়ানোর পরিমান ও উপকারিতা,
- সুষম খাদ্যের জন্য বিভিন্ন দানাদার খাদ্যে উপকরণ ও বিভিন্ন উপকরণের মিশ্রনের পরিমান,
- দুধ ছাড়ানো মহিষেকে ওজন ও দুধ উৎপাদন আনুযায়ী মিশ্রিত দানাদার খাদ্য সরবরাহের পরিমান,
- দুগ্ধবতী মহিষের ওজন ও দুধ উৎপাদন অনুযায়ী মিশ্রিত দানাদার খাদ্য প্রদানের পরিমান,
- গর্ভবতী মহিষেরকে মিশ্রিত দানাদার খাদ্য প্রদানের পরিমান,
- প্রচুর পরিমানে বিশুদ্ধ পানি খাওয়ানোর উপকারিতা।

কিভাবে ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় (ইউ.এম.এস) প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে হবে ঃ

ইউ.এম.এস তৈরীর প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ.এম.এস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস (চিটাগুড়) এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। এ হিসাব মতে ১০০ কেজি শুকনা খড়, ঘনত্বের উপর নির্ভর করে ১৫-২০ কেজি মোলাসেস (চিটাগুড়) ও ৩ কেজি ইউরিয়া মিশালেই চলবে । খড় ভিজা বা মোলাসেস পাতলা হলে উভয়ের পরিমাণই বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে। এর পর পানিতে ইউরিয়া ও চিটাগুড় মিশিয়ে উহা ভালভাবে খড়ের সাথে মিশাতে হবে। পানি বেশী হলে দ্রবণটুকু খড় চুষে নিতে পারবে না আবার কম হলে দ্রবণ ছিটানো সমস্যা হবে। শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে অস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয় ।

এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে । ওজন করা খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ মিশিয়ে নিলেই ইউ.এম.এস প্রাণিকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে গরুকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরী খড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে কোন অবস্থাতেই খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখা উচিৎ নয়। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেস এর পরিমাণ কমতে থাকবে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে সুবিধা ঃ

- ইউ.এম.এস ৬ মাসের উর্দ্ধে বাছুর গরু থেকে শুরু করে সকল বয়সের গরুকে তাদের চাহিদা মত খাওয়ানো যায়।
- শুধু ইউ.এম.এস খাওয়ালেও গরুর ওজন বৃদ্ধি পায়।
- ইউ.এম.এস তৈরীর পদ্ধতি সহজ। একজন শ্রমিক প্রায় ৫০০-৬০০ কেজি খড় তৈরী করতে পারেন।
- গবেষণা করে দেখা গাছে যে, এ পদ্ধতিতে খড়ের সঙ্গে ১.০০ টাকার মোলাসেস খাইয়ে প্রায় ৫.০০ থেকে ৭.০০ টাকার গরুর মাংস উৎপাদন সম্ভব।
- যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে, তাই প্রাণির বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা মত খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন। তবে প্রক্রিয়াজাত খড় তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করে রাখা যাবে না। কেননা তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করলে এর গুণগত মান কমে যাবে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে অসুবিধা

- ইউ.এম.এস পদ্ধতিতে ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানোর তেমন কোন অসুবিধা নেই। তবে ছয় মাসের কম বয়সের বাছুরকে ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়াতে সাবধনতা অবলম্বন ঃ

- ইউ.এম.এস তৈরী করার সময় অবশ্যই ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে।
- ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। ইউ.এম.এস এর গঠন পরিবর্তন করলে কাংখিত ফল পাওয়া যাবে না।

খাদ্য ব্যবস্থাপনায় পশুর অন্যান্য যত্ন ঃ

খাদ্য পরিবেশনার উপরও মহিষের খাদ্য গ্রহণের তারতম্য হয়। যেমন ঃ

- নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহ করা।
- মহিষের সম্মুখে সর্বদা খাদ্য রাখা।
- খাদ্য সরবরাহের আগে অবশ্যই পাত্র পরিষ্কার করা।
- দানাদার খাদ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মেপে ২ বারে (সকালে ও বিকালে) পরিবেশন করা।
- দানাদার খাদ্য আধা ভাঙ্গা অবস্থায় ভিজিয়ে খেতে অভ্যস্ত হলে সেভাবে দেয়া।
- শুকনা দানাদার খাদ্য দিলে খাদ্য গ্রহণের পরপরই পানি দেয়া।
- খড় কেটে ভিজিয়ে পরিবেশন করলে কম নষ্ট হয় এবং খাদ্যের গ্রহণ হারও বাড়ে ।
- খাদ্যে অবশ্যই মাটি/বালি মুক্ত থাকা।
- পঁচা, বাসি, অতি পুরাতন খাদ্য না হওয়া।

প্রাণিকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস খাওয়ালে উপকারিতা ঃ

- অধিক দুধ পাওয়া যাবে।
- খাদ্য খরচ কম হবে।
- গাভী সুস্থ-সবল বাছুর জন্ম দেবে।
- সঠিক বয়সে যৌন পরিপক্কতা আসবে।
- জন্মের সময় বাচ্চার মৃত্যু হার খুবই কম হবে, ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা কম হবে।
- গাভীর মৃত্যু হার খুবই কম হবে, ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা কম হবে।

- দানাদার খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কম হবে, ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে যাবে।
- জন্ম নেয়া বাছুরের দৈহিক ওজন কাংখিত মাত্রায় পাওয়া যাবে।
- রোগ-ব্যাধি কম হয় ফলে ঔষধ খরচ কমে যাবে এবং চিকিৎসা খরচ খুবই কম হবে।
- দুধ উৎপাদন বেশী হলে গরিব কৃষক দধু বিক্রয়ের পাশাপাশি নিজেরাও দুধ খেতে পারবেন এবং নিজেরাও সুস্থ সবল থাকবেন।
- এক একর জমিতে ধান চাষ করে যে লাভ পাওয়া যায়, ঘাস চাষ করলে তার চেয়েও বেশী লাভ পাওয়া যাবে।

প্রাণিকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস না খাওয়ালে অপকারিতা ঃ

- দুধ উৎপাদন কম হবে।
- প্রণি অপুষ্টিতে ভোগে এবং রোগ-ব্যাধি বেশী হবে।
- গাভির প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং ঘন ঘন প্রজনন করতে হবে।
- গভর্পাতের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।
- দুর্বল ও কম ওজনের বাছুরের জন্ম হবে। ফলে বাছুরের মৃত্যু হার বেড়ে যাবে।
- যৌন পরিপক্কতা দেরিতে আসবে।
- দুর্বলতার কারণে রোগ-ব্যাধি বেশী হওয়াতে চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যাবে।
- রোগ হলে উৎপাদন কমে যাবে ফলে কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- বাছুরের পরবর্তীতে আশাতিত ওজন পাওয়া যাবে না এবং উক্ত বাছুর থেকে আশানুরূপ উৎপাদনও পাওয়া যাবে না।
- দানাদার খাদ্য বেশী দরকার হয় ফলে গাভী পালনের খরচ বেড়ে যায়।

৪র্থ সেশন

মহিষের প্রজনন, গর্ভকালীন পরিচর্যা ও নবজাত বাছুরের পরিচর্যা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

মহিষ প্রজনন কার্যক্রম

- মহিষ প্রজনন উৎপাদন ক্ষমতা গরুর চেয়ে অনেক কম।
- মহিষের ১ম বাচ্চা উৎপাদন বয়স অনেক বেশী এবং দুই বাচ্চা উৎপাদনের মধ্যে সময়ের পার্থক্যও অনেক বেশী।
- মাদী মহিষ গরম হওয়ার লক্ষণ গরুর মত এত সহজে বুঝা যায় না। তাই কৃত্রিম প্রজননের কার্যক্রম মহিষে সহজ নয়।
- তবে ট্রিজার বুল হলে মহিষ গরম হওয়ার সময় নির্ণয় করা সহজ হয়।
- বাংলাদেশে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম এখনও পরীক্ষাধীন রয়েছে। তাই প্রাকৃতিক প্রজনন অর্থাৎ ষাঁড় দিয়ে সরাসরি মাদী মহিষকে পাল/প্রজনন করা হয়।
- দিনের দৈর্ঘ ও তাপমাত্রা কম হলে মহিষ প্রজনন অনেকটা অনুকুলে থাকে, অর্থাৎ প্রজননকাল অনেকটা ঋতু ভিত্তিক (Seasonal), তবে কম-বেশী সারা বছরই মহিষ প্রজনন হয়ে থাকে।
- নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস মহিষ প্রজননের কার্যক্রম সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে।
- গাভীর মতই মহিষের প্রজনন ঋতু চক্র।

গাভী/মহিষ প্রথম প্রজননের সময় ও গর্ভকালিন সময় ঃ

- গাভী/মহিষ এর বাছুরকে সুষ্ঠু পরিচর্যা করা হলে দেশী জাতের বকনা বাছুর ২৪-৩৬ মাস বয়সে এবং সংকর জাত/ইউরোপিয়ান জাতের বকনা বাছুর ১০-১৮ মাস বয়স থেকেই ডাকে আসে, অর্থাৎ

প্রজননের জন্য প্রস্তুত হয়। তবে বকনা বাছুরকে প্রথম প্রজননের জন্য তার বয়স ২২ মাস না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম।

- সাভাবিক অবস্থায় বকনা প্রতি ১৭-২০ দিন অন্তর এবং গাভী প্রতি ১৮-২৪ দিন অন্তর ডাকে আসে।
- বকনা বাছুর/গাভী প্রজননের জন্য ডাকে আসার পর ১২-২৮ ঘন্টা পর্যন্ত ডাকে থাকে। তবে প্রজননের জন্য ষাঁড় দিয়ে পাল দেয়া/কৃত্রিম প্রজনন করার উত্তম সময় হচ্ছে ডাকে আসার ১২-১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দেয়া/কৃত্রিম প্রজনন করা।
- বকনা বাছুর/গাভীকে প্রজনন করার পর থেকে বাছুর প্রসব করা পর্যন্ত সময় অর্থাৎ গর্ভবতী গাভী/মহিষ এর প্রসবকালীন সময় হচ্ছে ২৮০ (+/-১০) দিন।
- গাভী প্রসব করার ৬০-৯০ দিনের মধ্যে পুনরায় ডাকে আসে। এ সময় পুনরায় গাভীকে পাল দেয়া/কৃত্রিম প্রজনন করতে হবে।

গর্ভবতী মহিষ এর পরিচর্যা

- গর্ভধারণের শেষের দিকে দোহন বন্ধকরণ ও তার সুফল ঃ
    - ❖ উন্নতজাতের দুগ্ধবতী মহিষকে গর্ভধারণের ৮মাস পর্যন্ত দোহনের পর দোহন বন্ধকরণ,
    - ❖ দোহন বন্ধ করা না হলে নবজাত বাছুর অত্যন্ত নিস্তেজ ও দুর্বল হওয়া এবং গাভীর পরবর্তী দোহনে দুধ হ্রাস পাওয়ার বিষয়ে আলোচনা,
    - ❖ দোহন বন্ধ করার দিন থেকে ১/২ দিন মিশ্রিত দানাদার খাদ্য বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা,
    - ❖ এর পর দুধ বন্ধ হলে পুনরায় দানাদার খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা,
    - ❖ তবে প্রসবের প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব হতে মহিষের খাদ্যের পরিমান আস্তে আস্তে হ্রাসকরণ,
- প্রসবের আগে মহিষ এর জন্য পরিস্কার নরম বিছানার প্রয়োজনীয়তা,
- বাচ্চা জন্মানোর ৬-১২ ঘন্টার মধ্যে প্রসবকৃত মহিষের ফুল (Placenta) না পড়লে করণীয়,
- সময়মত ফুল (Placenta) পড়লে তখন সাথে সাথে তা সরিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলার উপকারিতা,
- গর্ভবতী মহিষকে প্রসবের পর কিছু দিন হালকা খাবার (যেমন কাঁচা ঘাস, গমের ভূষি, ইত্যাদি) প্রদানের সুফল,
- মহিষকে প্রসবের কিছু দিন পর পূর্বের ন্যায় পূর্ণ পরিমানে দানাদার খাদ্য সরবরাহের উপকারিতা।

বাছুরের পরিচর্যা

ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে বাছুরকে যথাযথভাবে লালন-পালন করতে হবে। বাছুরের যত্ন মূলত গাভী গর্ভবতী থাকা অবস্থা থেকেই হরতে হবে। এক্ষেত্রে গাভীকে অন্তত গর্ভের শেষ তিনমাস পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করতে হবে। বাছুরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগমুক্ত রাখার জন্য বিশেষ কয়েকটি নিয়মের প্রতি খেয়াল রাখলে ভবিষ্যতে অসুখ-বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

- অপরিষ্কার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে বাছুর প্রসব করলে বাছুরের বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। তাই গাভী প্রসবের প্রাক্কালে গাভীকে অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন ও শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।
- স্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ ব্যতীত অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেলে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহন করতে হবে।
- জন্মের পর পরই বাছুরকে শুকনো খড়কুটো বা ছালার উপর রাখতে হবে। বাছুরের নাক ও মখু মন্ডল হতে লালা বা ঝিল্লি পরিষ্কার করতে হবে। নতুবা শ্বাসরূদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই গাভী যেন তার নবজাত বাছুরকে চাটতে পারে সে সুযোগ করে দিতে হবে,

- যদি বাছুরের শ্বাস- প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তবে বুকের পাঁজরের হাড়ে আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পর পর কয়েক বার চাপ প্রয়োগ করতে হবে। বাছুরের নাকে, মুখে, নাভীতে ফুঁ দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।
- জন্মের সাথে সাথে বাছুরের নাভীতে কিছু এন্টিসেপটিক যেমন টিংচার আয়োডিন, ডেটল বা সেভলন লাগাতে হবে। ফলে ধনুষ্টংকর, নাভী ফুলা ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা থাকে না।
- গাভী যেন তার বাছুরকে চাটতে পারে সে সুযোগ করে দিতে হবে অথবা শুকনা খড় বা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বাছুরের শরীর ভাল ভাবে মুছে দিতে হবে। এ অবস্থায় বাছুরকে পানি দিয়ে ধৌত করা সমীচিন হবে না। কারণ, পানির সংস্পর্শে আসলে বাছুরের ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এবং নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে।
- নবজাত বাছুরকে ১-২ ঘন্টার মধ্যে শাল দুধ খাওয়াতে হবে, এই শালদুধ খাওয়ালে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এই দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' যা বাছুরের জন্য অত্যন্ত উপকারী।
- বাছুরকে দুই সপ্তাহ পর দুধ সরবরাহের সাথে সাথে অল্প পরিমাণ কচি ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাওয়ানো উচিত। নতুবা এর হজম ক্ষমতা কমে যাবে এবং পাকস্থলির পরিপক্কপতা দেরীতে আসবে।
- বাছুরের প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সময় মত খাদ্য ও পানি সরবরাহ দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে।

বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

- বাছুরের জন্মের পর থেকে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরকে যতটুকু পুষ্টিসাধন করা হবে পরবর্তী জীবনকালের বৃদ্ধি ও উৎপাদন তার উপর সিংহভাগ নির্ভর করবে।
- জন্মের প্রথম দিন থেকে সাধারণতঃ ৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধি ও ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ সময় যদি শরীরে পুষ্টির অভাব হয় তবে এর যৌনাঙ্গের বিকাশ ও যৌবন প্রাপ্তি দেরীতে আসবে। ফলে ভবিষ্যতে গর্ভ ধারণ ও বাচ্চা উৎপাদনও কম হবে। অনেক ক্ষেত্রে বাছুর পুষ্টির অভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে মারাও যেতে পারে। এসব কারণে জন্মের পর থেকেই পরিমিত খাদ্য সরবরাহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।
- জন্মের পরপরই বাছুরকে মায়ের শাল দুধ খাওয়াতে হবে। অর্থাৎ বাছুর জন্মানোর আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যে শাল দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে। শাল দুধ খাওয়ানোর নিয়ম হলো, বাছুরের ওজন ১০ কেজি হলে ১ কেজি শাল দুধ, বাছুরের ওজন ২০-২৫ কেজি হলে ১.২-১.৫ কেজি শাল দুধ খাওয়াতে হবে।
- বাচ্চাকে গাভী থেকে দুধ চুষে খেতে দিতে হবে । এতে গাভী বেশী দুধ দিবে এবং গাভী দেরীতে দুধ দেয়া বন্ধ করবে।
- সাধারণতঃ বাছুরকে দু'বেলা দুধ খেতে দিতে হবে এবং নিয়মিত একই সময়ে দুধ খাওয়াতে হবে।
- বাছুরকে দুই সপ্তাহ পর দুধ সরবরাহের সাথে সাথে অল্প পরিমাণ কচি ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন। তা করা না হলে বাছুরের হজম ক্ষমতা কমে যাবে এবং পাকস্থলির পরিপক্কপতা দেরীতে আসবে।
- জন্ম থেকে দুধ ছাড়া পর্যন্ত বাছুরকে দুধ, দানাদার ও ঘাস সরবরাহ এর পরিমান ঃ

বয়স	দৈনিক	দানাদার ও ঘাস সরবরাহ
০-৭ দিন (১ম সপ্তাহ)	২ লিটার	এ বয়সে দানাদার ও খড় ঘাসের প্রয়োজন নেই।
২য় সপ্তাহ	৩ লিটার	দানাদার খাদ্য অর্থাৎ কাফ স্টার্টার (২০% আমিষ সমৃদ্ধ) এবং কিছু কচি সবুজ ঘাস বাছুরকে সরবরাহ করতে হবে।
৩য়-১২ সপ্তাহ	৪ লিটার	• দৈনিক ০.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ১ কেজি হারে

বয়স	দৈনিক	দানাদার ও ঘাস সরবরাহ
(৩ মাস)		উচ্চ মানের কচি নরম সবুজ ঘাস দিতে হবে। ● দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।
১৩-১৬ সপ্তাহ (৪ মাস)	৩ লিটার	● দৈনিক ০.৭৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৩ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে। ● দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।
১৭-২০ সপ্তাহ (৫ মাস)	২ লিটার	● দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৭ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে। ● দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।
২১-২৪ সপ্তাহ (৬ মাস)	১ লিটার	● দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৭ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে। ৬ মাস এর পর থেকে বাছুরকে দুধ খায়োনোর প্রয়োজন হয় না। ● দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।

- বাছুরকে অতিরিক্ত দুধ সরবরাহ করা হলে বাছুরের পেট খারাপ হবে এবং বাছুর দুর্বল হয়ে পড়বে। এ সময়ে বাছুরের চিকিৎসা না করলে বা বাছুরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি না রাখলে বাছুর অন্যান্য জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ খাওয়ানো সুধু পেট খারাপ নয়, অপচয়ও বটে। ছয় মাসের উর্দ্ধে বাছুরকে দুধ পান করানো থেকে বিরত রাখতে হবে। তবে এ সময়ে তাদেরকে পরিমানমত দানাদার খাদ্য, সবুজ ঘাস ও খড় সরবরাহ করতে হবে।

- ছয় মাসের উর্দ্ধে বাছুরকে দুধ, দানাদার, সবুজ ঘাস ও খড় সরবরাহ এর পরিমান ঃ

২৫-৩৫ সপ্তাহ	দুধ পান বন্ধ করতে হবে।	● দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৭ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস ও কিছু খড় দিতে হবে। ● দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না। ● বাছুর গরুর বয়স ছয় মাস পার হলে তার ওজনের ১% ইউএমএস দানাদার খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
৩৬-৫০ সপ্তাহ	-	● দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ১০-১২ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস ও ১-২ কেজি খড় দিতে হবে। ● দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না। ● বাছুর গরুর ওজনের ১% ইউএমএস দানাদার খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

<u>বাছুরের জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ ফরমূলা</u>

১.	গমের ভুষি	৪০%
২.	ডালের ভুষি	১৫%
৩.	ছোলা ভাংগা	১০%
৪.	তিলের খৈল	১৫%
৫.	মাটি কলাই ভাংগা	১০%
৬.	ভুট্টা ভাংগা	৫%
৭.	খনিজ দ্রব্য	৪%
৮.	লবণ	১%
		মোট = ১০০%

বাছুরের বাসস্থান

বাছুরকে রোগমুক্ত রাখার জন্য তাদেরকে আলাদা আলাদা ঘরে রাখতে হবে এবং এর ফলে প্রতিটি বাছুরের রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে। অনেক বাছুর একসাথে থাকলে দুর্বল বাছুরগুলো আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ দুর্বলগুলো সবলদের সাথে প্রতিযোগীতা করে প্রয়োজন মত খেতে পারে না।

- বাছুরের ঘর ঢালু এবং শুকনো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন।
- বাসস্থানে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের সরাসরি প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম ও শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডা দ্বারা বাছুরগুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ঘরের মেঝেতে শুকনো খড় বা ছালার চট বিছিয়ে দিতে হবে।
- গ্রামীণ পর্যায়ে বাঁশ ও কাঠের সাহায্যে অতি সহজেই ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে।
- ঘরে খাদ্য ও পরিষ্কার পানি সরবরাহের জন্য পাত্র রাখতে হবে।
- বাছুরের ঘর স্যাঁতস্যাঁতে ময়লা আবর্জনাময় হলে বাছুরের শ্বাস কষ্ট হয়।
- **সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বাছুরকে তিন দলে ভাগ করে বাছুরের বাসস্থান করা প্রয়োজন ঃ**
  ১. এক বছরের কম বয়সী।
  ২. এক বছরের বেশী বয়সী বকনা বাছুর।
  ৩. এক বছরের বেশী বয়সী এঁড়ে বাছুর।

বাছুরের বিভিন্ন রোগ এর লক্ষণ ও উহার প্রতিকার সম্পর্কে প্রয়োজন অনুযায়ী আলোচনা করতে হবে ঃ

১. সংক্রামক রোগ ঃ

- ➢ সাদা বাহ্য বা কাফ স্কাওয়ার, নেভাল ইল বা নাভীর রোগ, সালমোনেলোসিস, নিউমোনিয়া, বাদলা, তড়কা, ধনুস্টংকার, ক্ষুরারোগ, জলাতংক, ইত্যাদি। এ সকল রোগ দমে ভেটেরিনারী ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. কৃমি বা পরজীবীজনিত রোগঃ পরজীবী সাধারনত দুই ধরনের হয় ঃ

- ➢ দেহাভ্যন্তরের পরজীবী/কৃমি ঃ গোল কৃমি, ফিতা কৃমি, পাতা কৃমি। এসকল রোগ দমনে বাছুরকে দু'মাস বয়স হলে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো আরম্ভ করতে হবে।
- ➢ বহিঃদেহের পরজীবী ঃ এগুলোকে দেহের পোকা বলা হয়। এরা বাছুরের ত্বকে বাস করে ত্বকের যথেষ্ট ক্ষতি কওে থাকে। বহিঃদেহের পরজীবীর মধ্যে বাছুরে আঁঠালি, উকুন, মাছি,

মাইটস বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বহিঃদেহের পরজীবী দমনে বাছুরের শরীর ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।

- বাছুরের বয়স ৬ মাস হলে ভেটেরিনারী ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী বহিঃদেহের পরজীবী ধ্বংসকারী ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

৩. প্রোটজোয়াজনিত রোগ ঃ

- প্রোটোজোয়া এক প্রকার এককোষী জীব। বাছুর বিভিন্ন ধরনের প্রোটোজোয়া রয়েছে যেমন ঃ বেবেসিয়া, এনাপ্লাজমা, ককসিডিয়া, ইত্যাদি। তবে বাছুরে সাধারণতঃ ককসিডিয়া নামক প্রোটোজোয়ার আক্রমণ বেশী হতে দেখা যায়।
- এ রোগ দমনে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. সাধারণ রোগ-ব্যাধি ঃ

- নবজাত বাছুরের সাধারণ রোগ ঃ নবজাত বাছুরের সাদা উদরাময় রোগ (Calf Scours), বাছুরের নাভি ফোলা রোগ।
- অন্যান্য বাছুরের সাধারণ রোগ ঃ বিষক্রিয়াজনিত রোগ, অপুষ্টিজনিত রোগ, পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ যেমন- পেট ফাঁপা, উদারাময়, কোষ্ঠকাঠিণ্য এবং বিপাকীয় রোগ।
- এ সকল রোগের চিকিৎসাও ভেটেরিনারী ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী করতে হবে।

৫ম সেশন

সিআইজি সদস্যদের কার্যক্রম; পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

সিআইজি এর কার্যক্রম ঃ

১. কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (CIG) হচ্ছে কিছু সংখ্যক কৃষক বা খামারীদের নিয়ে এমন একটি সংগঠন যাদের জীবিকা নির্বাহে মূখ্য কর্মকান্ড সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এদের অধিকাংশ সদস্য একই আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পন্ন ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

২. এনএটিপি-২ প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি প্রাণিসম্পদ CIG গঠন করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি CIG-তে ৩০ জন কৃষক বা খামারী সদস্য রয়েছে। এদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারী ৮০% এবং বড় ও মাঝারীসহ অনান্য খামারী ২০% সদস্য থাকতে পারবেন। উপজেলার মোট সিআইজি এর মধ্যে নারী সদস্যদের সংখ্যা হবে ন্যূনতম ৩৫%।

৩. CIG পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা করার জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে। গোপন ভোটে বা সমঝোতার ভিত্তিতে কমিটি গঠিত হবে। এজন্য ৭ (সাত) দিন পূর্বে একটি সভা অনুষ্ঠানের জন্য স্থান, সময় ও তারিখ উল্লেখ পূর্বক নোটিশ প্রদান করতে হবে।

৪. নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ হবে :

১) সভাপতি	-	১ জন
২) সহ-সভাপতি	-	১ জন
৩) সম্পাদক	-	১ জন
৪) কোষাধ্যক্ষ	-	১ জন
৫) সদস্য	-	৫ জন

উক্ত কমিটির নাম জনগণের দেখার জন্য কমিটির তালিকা একটি উন্মুক্ত স্থানে টানানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সহযোগিতা প্রদান করবেন। কমিটির মেয়াদ হবে ২ বছর।

কমিটি গঠন সংক্রান্ত রেজুলেশন রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরবর্তীতে মাসিক ও বিশেষ সভার রেজুলেশন উক্ত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

CIG নির্বাহী কমিটির প্রধান প্রধান কার্যাবলী ঃ

CIG গঠন ও ব্যবস্থাপনা হলো কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে CIGগুলো নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার পরিকল্পণা প্রণয়ন, উন্নত বাজার ব্যবস্থাপনা, মাইক্রোপ্লান প্রণয়ন ইত্যাদি সম্পাদনে সক্ষমতা অর্জন করবে। UEFT তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। CIG নির্বাহী কমিটির প্রধান প্রধান কার্যাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

১. নির্বাহী কমিটি CIG সদস্যদেরকে মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে এবং স্থানীয় যে কোন একটি তফসিলি ব্যাংকে CIG এর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে অর্থ জমা করবে। সে সঙ্গে সদস্যদের মাসিক সঞ্চয় এর টাকা একটি পৃথক রেজিষ্টারে রেকর্ডভূক্তি করে হিসাব সংরক্ষণ করবে। CIG সদস্যগণ মাসিক সঞ্চয়ের হার বা পরিমাণ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেবেন।

২. নির্বাহী কমিটি CIG সমষ্টিগত স্বার্থে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ ও মজুদ অর্থ ব্যবহারে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন।

৩. নির্বাহী কমিটি সমবায় দপ্তরে CIG নিবন্ধন (CIG Registration) করে CIG-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের এর ব্যবস্থা নেবেন।

৪. নির্বাহী কমিটি প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে CIG সদস্যদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উহা সমাধানে প্রতি বৎসর প্রযুক্তি প্রদর্শনী গ্রহণ, গবাদি প্রাণি-হাঁস-মুরগীর কৃমিণাশক ও টিকা প্রদানের ক্যাম্পিং, ইত্যাদি বাস্তবায়নে সিআইজি মাইক্রোপ্লান প্রণয়ন ও তা উপজেলা সম্প্রসারণ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির নিমিত্তে Community Extension Agent for Livestock (CEAL) এর নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৫. উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে CIG সদস্যগণ প্রদর্শণী থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তি নিজ নিজ খামারে ব্যবহার করবেন এবং প্রত্যেক CIG সদস্য উক্ত প্রযুক্তি নিজ খামারের পার্শ্ববর্তী কমপক্ষে ৩(তিন) জন নন-সিআইজি কৃষক/খামারীকে গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করবেন (পরবর্তীতে উন্নত প্রযুক্তিব্যবহার বিষয়ে নন-সিআইজি কৃষক/খামারীদেরকেও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হবে)।

৬. নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারকারী সিআইজি ও নন-সিআইজি সকল সদস্যদের নাম, ঠিকানা এবং উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্বে ও পরে উৎপাদনের রেকর্ড একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

৭. CEAL এর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ করে সিআইজি সদস্যদের প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধান করবেন।

৮. CEAL সদস্যদের সহযোগিতায় বিভিন্ন উপকরণ যেমন প্রাণি খাদ্য, মুরগির বাচ্চা, বিভিন্ন সংক্রামক/মারাত্মক রোগের টিকা, উন্নতজাতের ঘাসের কাটিং ইত্যাদি সময়মত সহজলভ্য করা অথবা পরামর্শ দেবেন।

৯. CIG -এর নির্বাহী কমিটির সভায় প্রযুক্তি বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহনের জন্য CEAL সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাবেন, ইত্যাদি।

১০. নির্বাহী কমিটি মাসে কমপক্ষেএকবার অথবা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়মিতভাবে CIG-এর সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া।

CIG -এর সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ঃ

CIG -এর সঞ্চয় কার্যক্রম ঃ

CIG-কে একটি কার্যকরী সংগঠন হিসেবে টিকে থাকতে হলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে,

এর জন্য প্রয়োজন CIG-এর নিজস্ব তহবিল। CIG সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে এই তহবিল গঠিত হতে পারে। নির্বাহী কমিটি CIG সদস্যদেরকে মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে এবং স্থানীয় যে কোন একটি তফসিলি ব্যাংকে CIGএর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে অর্থ জমা করবে। সে সঙ্গে সদস্যদের মাসিক সঞ্চয় এর টাকা একটি পৃথক রেজিষ্টারে রেকর্ডভূক্তি করে হিসাব সংরক্ষণ করবে। CIG সদস্যগণ মাসিক সঞ্চয়ের হার বা পরিমাণ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিবেন। উক্ত তহবিলের মাধ্যমে CIG সদস্যগণ ব্যক্তিগত বা সংগঠনগতভাবে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করতে পারে। নির্বাহী কমিটি CIG সমষ্টিগত স্বার্থে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ ও মজুদ অর্থ ব্যবহারে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এ জন্য-

১. সঞ্চয়ের জন্য প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত পাশবই এবং CIG -এর জন্য একটি রেজিষ্ট্রার খুলতে হবে। রেজিষ্টারটি CIG -এর কোষাধ্যক্ষ সংরক্ষণ করবে।

২. যে কোন তফসিলি ব্যাংকেCIG -এর নামে একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে।

৩. CIG -এর সভাপতি, সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ-এর যৌথ নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে, তবে যে কোন দুইজনের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে, যেখানে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।

৪. বার্ষিক সাধারন সভায় CIG -এর আয়-ব্যয় সম্পদ ও দায়ের হিসাব প্রস্তুতপূর্বক উপস্থাপন করতে হবে।

৫. CIG সমষ্টিগত স্বার্থে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

৬. CIGহিসাব সংক্রান্ত সকল প্রকার কর্মকান্ডের তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

৭. সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত তহবিল ব্যক্তিগত বা সংগঠনগতভাবে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করতে পারবে।

৮. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৯. প্রকল্প থেকে ম্যাচিং গ্র্যান্ট সুবিধা নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কার্যত্রম গ্রহণ করবে ইত্যাদি।

১০. সিআইজি সঞ্চয় কার্যক্রমের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রতিটি সিআইজি-তে ১টি সঞ্চয় রেজিষ্টার রাখতে হবে। সিআইজি সদস্য/সদস্যাদের সঞ্চয়ের হিসাব রাখার জন্য রেজিষ্টারে নিম্লোক্ত ছক ব্যবহার করা যেতে পারে:

ক্রমিক ইং	সদস্য/সদস্যাদের	প্রারম্ভিক/পূর্বের জের	মাসের নাম:					মাসের নাম:	
			এ মাসে জমা	এ পর্যন্ত জমা	এ মাসে উত্তোলন	এ পর্যন্ত উত্তোলন	মাস শেষে ব্যালান্স	এ মাসে জমা	এ পর্যন্ত জমা
১									
২									
৩-২৯									
৩০									
	সঞ্চয়ের লাভ/ অন্যান্য প্রাপ্তি								
	মোট প্রাপ্তি								
	ব্যয়								
	অবশিষ্ট								

বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ঃ

সিআইজির সঞ্চিত তহবিল বিভিন্ন উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সদস্য/সদস্যাদের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যাবে। এ জন্য সিআইজি সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় যেমন বিনিয়োগযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণ, বিনিয়োগের পরিমাণ, ব্যবহারের শর্তাবলী, বিতরণকৃত অর্থ ফেরতের সিডিউল ইত্যাদি সভার কার্যবিবরণীতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। প্রতিটি বিনিয়োগের আলাদা আলাদাভাবে হিসাব রাখতে হবে।

পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা

১. পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্ষতিকর কর্মকান্ড থেকে পরিবেশ ও সমাজকে রক্ষা করা,অর্থাৎ প্রাণিসম্পদ এর সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের ফলে যাতে পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বিরূপ প্রভাব না ঘটে সে দিকে সচেতন থাকতে হবে।

২. তাই অত্র প্রকল্পে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কার্যক্রমে পরিবেশ ও সামাজিক বিরূপ প্রভাব হয় এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. প্রাণিসম্পদ সিআইজি মাইক্রোপ্ল্যান প্রণয়নের সময় যাতে জীব বৈচিত্র্য হারিয়ে না যায় বা পরিবেশ দূষণের ফলে প্রাণির স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা নিতে হবে। এ জন্য পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে সিআইজি ও সিল সদস্যদের-কে উদ্বুদ্ধ পূর্বক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. প্রণির দেহে বিভিন্ন পথে রোগে-জীবনু প্রবেশ করতে পারে, যেমন- মুখ, নাক, পায়ুপথ, দুধের বাট, চামড়ার ক্ষতস্থান, চোখ, ইত্যাদি। সাধারণত পরিবেশ সুরক্ষা না থাকলে এ সকল পথে রোগে-জীবনু সহজেই প্রবেশ করতে পারে। যেমনপরিবেশে বাতাস/পানি দুষিত থাকলে, রোগাক্রান্ত/মৃত প্রাণির যথাযথ ব্যবস্থা না নিয়ে চলাচল/স্থানান্তর করা হলে, প্রাণির পরিচর্যাকারী কোন রোগাক্রান্ত প্রাণির সংস্পর্শে এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিয়ে সুস্থ প্রাণির পরিচর্যা করলে, প্রাণিকে পঁচা/বাসি খাদ্য সরবরাহ করা হলে, হাট/বজারে অসুস্থ প্রাণি নিয়ে আসলে, ইত্যাদি। তাই পরিবেশ সুরক্ষায় এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. প্রাণির রোগ মুক্তি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মৃত প্রণি যত্রতত্র মাঠে ময়দানে বা ঝোপঝাড়ে না ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।

৬. বাজার/অন্য কোনভাবে ক্রয়কৃত প্রাণিকে বাড়িতে/খামারে এনে সরাসরি অন্য প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে না। প্রয়োজন বোধে উক্ত প্রণিকে ৭-২১ দিন পর্যন্ত পৃথকভাবে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যদি নতুন প্রণির মধ্যে রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ না প্রায়, তখন বুঝতে হবে বাড়ির/খামারের অন্যান্য প্রাণির সাথে এই প্রণিকে একত্রে পালতে কোন সমস্যা নাই।

৭. প্রাণিকে সময়মত টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজের খামারের প্রণিকে টিকা প্রদানের সাথে সাথে পার্শ্ববতী বাড়ি/খামারের প্রাণিকেও ঠিক একই প্রকারের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. পোলট্রির সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কল্পে জীবনিরাপত্তায় নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে ঃ

- অসুস্থ প্রাণিকে পৃথকী করণ।
- খামারে অভন্তরে বহিরাগতদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণকরণ।
- একটি সেডে একই বয়সের ব্রীড এর হাঁস/মুরগী পালন।
- স্বাস্থ্যবিধান (Sanitation) পদ্ধতি যথাযথভাবে পালন।

৯. প্রাণির বাসস্থান/খামার/আঙ্গিনা দৈনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

১০. প্রাণিকে প্রত্যহ পরিষ্কার পানি, টাটকা খাদ্য খাওয়াতে হবে।
১১. প্রাণির খাবার পাত্র ও পানির পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন করতে হবে।
১২. আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় প্রাণিকে আর্সানিক মুক্ত পানি খাওয়ানোর বিষয়ে সচেতন হতে হবে।
১৩. প্রণির উৎপাদিত পণ্য যেমন দুধ/মাংশ/ডিম এর গুণগত মান রক্ষায় সচেতন থাকতে হবে।
১৪. প্রাণির খাদ্য উপাদান ভেজালমুক্ত ও গুণগত মান হতে হবে।
১৫. প্রাণিকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
১৬. প্রাণির খামার স্থাপনে লোকালয়/মানুষের বাসস্থান থেকে একটু দূরে করতে হবে।
১৭. অতিরিক্ত শীত/গরম ও খড়া/বন্যা/প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় প্রাণি স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। এ সময়ে ঘাস চাষ কম হয় এবং প্রণির খাদ্য অপ্রতুল/দুস্প্রাপ্য থাকে। অনেকে এ সময়ে প্রাণি বিক্রি করে পরবর্তীতে সামাজিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাই এ দিক বিবেচনায় রেখে অগাম প্রস্তুতি হিসাবে সময়পোযুগী দ্রুত বর্ধনশীল ঘাস চাষের ব্যবস্থা নিতে হবে।
১৮. সম্প্রসারণ কার্যক্রমে মহিলা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বার্থ/সুবিধা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
১৯. পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষায় সিআইজি সদস্যদের সভায় উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়মিত আলোচনা করে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং পার্শ্ববর্তী নন-সিআইজি সদস্যদেরও বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে জানাতে হবে।
২০. পরিবেশে বায়ু দুষণ কমানোর জন্য প্রাণির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সিআইজি/সিল/এডপ্টারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মুরগীর খামারে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা হল সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ যা অবশ্যই রোগ জীবানুর বিস্তারের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে। রোগবালাই থেকে মুক্তরাখতে সকল ব্যবস্থা সমূহকে নিশ্চিতকরণ এর নাম জীবনিরাপত্তা। একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে এমনভাবে পোল্ট্রিফার্ম তৈরি করতে হবে, যাতে সেখানে কোন রোগ বালাই এর জীবানু ঢুকতে না পারে। ফলে খামারিরা লাভবান হতে পারবেন।

মুরগীর রোগবালাই এর মূল কারণ হচ্ছে ঃ

- ভাইরাস (এভিয়ান ইনফুয়েনজা, রানীক্ষেত, ইত্যাদি)
- ব্যাক্টেরিয়া (ফাওল কলেরা, সালমোনেলা, ইত্যাদি)
- ফাংগাস (এসপারজিলোসিস, মোল্ড, ইত্যাদি)
- প্রোটোজোয়া এবং প্যারাসাইট (কক্সিডিওসিস, কৃমি)

এই রোগগুলো যদি খামারে ঢুকতে না পারে তাহলে মুরগির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়া যাবে।

রোগ-বালাই ছড়ানোর পদ্ধতি ঃ

নিম্নলিখিতভাবে রোগ ছড়াতে পারে ঃ

- সরাসরি ছড়ানো
- মুরগি থেকে মুরগি
- হাঁস থেকে মুরগি
- শুকর থেকে মুরগি

❖ ইঁদুর থেকে মুরগি

❖ বন্যপাখি থেকে মুরগি

❖ কুকুর-বিড়াল থেকে মুরগি, ইত্যাদি

মানসম্পন্ন খাদ্য ও পানি ঃ

প্রস্তুতকৃত খাদ্য যেন গুণগত মান সম্পন্ন হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। খাদ্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ভালভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষণ করলে খাদ্যে মাইকোটক্সিন উৎপন্ন হতে পারে। সেই সাথে অন্যান্য জীবানু যেমন সালমোনেলা, ইকলাই, ককসিডিয়া ইত্যাদির সংক্রমন হতে পারে। খাদ্য ও পানির পাত্র যেন মুরগীর পায়খানা দ্বারা দুষিত না হতে পারে তার জন্য মুরগীর উচ্চতা অনুযায়ী উপরের দিক থেকে পাত্র ঝুলিয়ে দিতে হবে। খাদ্য ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষণ ঃ

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পোল্ট্রি উৎপাদন ও রোগ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কঠিন ও ব্যয়বহুল নয়। নিচের বিষয়গুলো মেনে চললে সহজেই স্বাস্থ্যকরভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

১। **নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ ঃ** মুরগীর খামারের শ্রমিকরা প্রতিদিন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এবং হাত পা জীবানুমুক্ত করে শেডে প্রবেশ করবে। প্রথমে অসুস্থ ও মরা মুরগী দ্রুত সরিয়ে ফেলবে এবং নিয়মিত মুরগীর বিষ্ঠা পরিস্কার করবে।

২। **অযাচিত প্রাণি ঃ** খাদ্য এবং অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ইঁদুর, বিড়াল, ছুঁচো ইত্যাদি প্রাণির বসবাসের জন্য খুবই সহায়ক। এরা নিজেরা বিভিন্ন রোগের উৎস হিসেবে কাজ করে এবং মল মূত্রাদির মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে।

৩। **পোকাকামড় নিয়ন্ত্রণঃ** পোকা কামড় রোগের উৎস ও পরজীবি বা অন্য রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। এক ব্যাচ শেষ করার পর খামারের সকল আবর্জনা, মাকড়সার ঝুল একত্রে করে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে অথবা কম্পোষ্টিং পিটে ফেলতে হবে। সকল যন্ত্রপাতি ও ঘর ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার পানি দিয়ে ধোঁয়ার পর জীবানু নাশক দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে।

৪। **হিংস্র জন্তু ও অন্যান্য পাখি নিয়ন্ত্রণ ঃ** এরা বিভিন্ন সংক্রামক ও পরজীবি জনিত রোগের জীবানু বহন করে। মৃত মুরগী যত্রতত্র ফেলে রাখলে সেগুলো খাওয়ার জন্য খামারে কাক বা বন্য পাখি, বন বিড়াল, শিয়াল, কুকুর ইত্যাদি আসতে পারে। খামারের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে এবং বন্য পাখি নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

৫। **মৃত মুরগী সৎকার ঃ** মৃত মুরগীর দেহাবশেষ নিজেই রোগের উৎসে পরিণত হয় যা খামারের অন্যান্য মুরগীতে এবং আশেপাশের খামারের সংক্রমনের উৎস হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৃত মুরগীর সৎকার করা যায়। যেমনঃ (ক) পোড়ানোঃ সংক্রামক জীবানুকে ধ্বংস করার সর্বোত্তম পদ্ধতি বাণিজ্যিকভাবে ধোঁয়াবিহীন, দুর্গন্ধবিহীন পোড়ানোর চুলি বাজারে সহজলভ্য। (খ) গভীর গর্তে পুঁতে ফেলাঃ পরিবেশ আইন মেনে বড় গর্ত করে আবর্জনা গভীর গর্তে পুঁতে ফেলাই উত্তম। এতে শিয়াল, কুকুর জাতীয় প্রাণী বর্জ্যের নাগাল পাবে না। সাধারণ বর্জ্যের জন্য ছোট গর্ত করে বিভিন্ন বর্জ নিষ্কাশন করা যায়।

৭। **পৃথকীকরণ ঃ** অনুজীবের বিস্তার পৃথকীকরণের মাধ্যমে ঠেকানো সম্ভব। রুগ্ন বা আক্রান্ত মুরগীকে স্বাস্থ্যবান নিরোগ মুরগী থেকে পৃথক করে রাখা উচিত এবং নিরোগ মুরগীকে পরিচর্য্যার জন্য ভিন্ন শ্রমিক নিয়োগ করা উচিত। সবচেয়ে ভাল হয় রুগ্ন মুরগীকে বর্জ্য হিসেবে সৎকার করে ফেলা, কারণ এই সব রুগ্ন মুরগী আরোগ্য লাভ করলেও দীর্ঘ সময় ধরে জীবানুবাহক হিসেবে কাজ করতে পারে।

৮। **ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ঃ** ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার এবং খামারের মালিকগণকে পরিচ্ছন্নতা নিয়মাবলী অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। খামারে দর্শণার্থী প্রবেশ যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে যদি কোন দর্শণার্থী মুরগীর শেডে প্রবেশ করতে চায় তবে জুতা পরে জীবানুনাশক দ্রবণে হাত পা ধুঁয়ে খামারে প্রবেশ করতে হবে।

৯। **টিকা প্রয়োগ ঃ** মুরগীকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষার জন্য টিকা দেওয়া অত্যাবশ্যক। কিছু রোগ সঠিক সময়ে গুণগত মান সম্পন্ন টিকা প্রদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব।

পরিবেশ সুরক্ষায় খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা ঃ

১. গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগি ইত্যাদির সরবরাহকৃত খাদ্যের ৫০-৬০% মল ও মূত্র হিসাবে বেরিয়ে আসে যা আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে নষ্ট বা অপচয় হওয়ার কারণে পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটে।

২. খামার ব্যবস্থাপনায় গবাদিপ্রাণিকে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করায় রুমেন থেকে মিথেন উৎপাদন প্রায় ৩০%হ্রাস পায় ও পরিবেশ সুরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৩. প্রাণির রোগ মুক্তি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মৃত প্রাণির চামড়া ছাড়ানো যাবে না। মৃত পশু-পাখী যত্রতত্র মাঠে ময়দানে বা ঝোপঝাড়ে না ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।

৪. প্রাণিকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে।

৫. পরিবেশ সুরক্ষায় গোবর/বিষ্ঠা, মূত্র, প্রণি খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে ও সময়মত অপসারণ করলে পরিবেশ সুরক্ষিত হবে। একাজে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করা যেতে পারে।

৬. গোবর/বিষ্ঠা থেকে কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত করা হলে একদিকে পরিবেশে দূর্গন্ধ দুর হয় ও অন্যদিকে উৎপাদিত কম্পোষ্ট সার কৃষিতে ব্যবহার করায় কৃষির উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

৭. বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী উৎপাদন হওয়ায় দুষণমক্ত বায়ু ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নত মানের জৈব সার উৎপাদন হয়। তাই বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সামাজিক নিরাপত্তায় অবদান রাখছে।

৮. বর্জ্য সঠিকভাবে কম্পোষ্ট করা হলে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস মারা যায় ও প্রাণির রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়।

৯. খড় এর সাথে মোলাসেস মিশিয়ে গো/মহিষকে খাওয়ালে গো/মহিষ থেকে ৩০-৩৫% মিথেন গ্যাস উৎপাদন কমে আসবে এবং পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

কম্পোস্টিং এর মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ

কম্পোস্ট ও কম্পোষ্টিং প্রক্রিয়া

❖ কম্পোস্ট হচ্ছে পচাঁ জৈব উপকরণের এমন একটি মিশ্রণ যা উষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে অনুজীব কর্তৃক প্রক্রিয়াজাত হয়ে উদ্ভিদের সরাসরি গ্রহন উপযোগী পুষ্টি উপকরণ সরবরাহ করে।

❖ কম্পোষ্টিং বা পচানো হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি জৈবপচন প্রক্রিয়া, যা জৈব পদার্থকে স্থিতিশীল দ্রব্যে রূপান্তর করে।

❖ যে সকল অনুজীব পচনশীল পদার্থকে তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে, সে সকল অনুজীবের উপর এ প্রক্রিয়া নির্ভরশীল।

❖ কম্পোষ্টিং প্রক্রিয়ায় বর্জ্যের গন্ধ ও অন্যান্য বিরক্তিকর সমস্যা সম্বলিত পদার্থকে স্থিতিশীল গন্ধ ও রোগ জীবানু, মাছি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের প্রজননের অনপুযোগী পদার্থে রূপান্তরীত করে।

❖ এই প্রক্রিয়াটি চলার সময় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরিত্যক্ত বর্জ্যে প্রক্রিয়ার ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতে রোগ জীবানু ধ্বংস হয়ে যায়।

- ❖ মুরগির বিষ্টা ও আবর্জনার প্রকারভেদে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত হওয়ার সময় ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে কম্পোস্ট সার হিসাবে তখনই উপযুক্ত হবে যখন তার রং গাড় বাদামী হবে, তাপ কমে আসবে এবং একটা পঁচা গন্ধ বের হবে।
- ❖ কম্পোষ্ট তৈরীর জন্য খামারের একপাশে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে স্থানটি চারদিকে নির্দিষ্ট মাপের (দৈর্ঘ্য ৮ ফুট, প্রস্থ ৫ ফুট ও গভীরতা ৫ ফুট) ইট দিয়ে ঘিরে একটি পিট তৈরী করতে হবে। জৈব বর্জ্যের মিশ্রণ খড়, মুরগীর দেহাবশেষ, বিষ্ঠা ও পানির অনুপাত হবে যথাক্রমে ১ ঃ ১ ঃ ১.৫ ঃ ০.৫ । প্রতি স্তরে তিন ভাগ পানি যোগ করতে হবে। উক্ত অনুপাত ঠিক রেখে মিশ্রণটি তৈরী হলে দ্রুত এবং গন্ধহীনভাবে বর্জ্য কম্পোষ্টিং হবে। কম্পোষ্টিং প্রক্রিয়া ১৪ দিনের মধ্যে সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন, সারা দিন প্রশিক্ষণের সার সংক্ষেপ আলোচনা ও সমাপ্তিকরণ ঃ

- প্রশিক্ষণ সংগঠক প্রশিক্ষণ সমাপ্তি অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।
- তিনি প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে ২/৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে তাঁদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য আহ্বান জানাবেন।
- এ সময় প্রশিক্ষণার্থীগণ খোলামেলাভাবে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করবেন এবং প্রশিক্ষণ থেকে তাঁদের প্রাপ্ত জ্ঞান খামার পরিচালনায় বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোকপাত করবেন।
- পরিশেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক এক দিন প্রশিক্ষণের সার সংক্ষেপ আলোচনা করবেন এবং সিআইজি সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ নিজ খামারে কাজে লাগিয়ে প্রাণির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।